'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২০সালে প্রকাশিত ৮৬পৃ.তালিকার ৬০ পৃ.এবং ৮৪পৃ.উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১৩০ সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০২১

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা
সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

৩৪.বাংলায় বিভিন্ন যৌনতা ও লিঙ্গ নির্মাণের পর্যালোচনা
:: রাজর্ষি চক্রবর্তী.....২৫৩
৩৫.বাউল ও ঝাঁকবাউল : সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য:: রাজুরাম সরদার.....২৬৪
৩৬.বিশেষ ব্যতিক্রমী শিক্ষার ধারণার প্রেক্ষাপট
:: লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়াই.....২৭২
৩৭.ঋতুপর্ণ ঘোষ-এর বাংলা চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রের অবস্থান
:: সৌরভ সাহা.....২৭৮
৩৮.ন্যায় মতে প্রমাণ: একটি সমীক্ষা :: সেখ আমিরুল হক.....২৮৬
৩৯.পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষার রূপরেখা বৈচিত্র্য
:: পারুল মাজী.....৩০১
৪০.পরমার নৃপতি উপেন্দ্রের রাজনৈতিক কার্যকলাপ
:: মল্লিকা ঘোষ.....৩০৭
৪১.শাহ্‌যাদ ফিরদাউসের 'শাইলকের বাণিজ্য বিস্তার'
উপন্যাসে সময় ও সমাজের দ্বান্দ্বিক পরিসর::বরুণজ্যোতি চৌধুরী.....৩১১
৪২.সমাজবাস্তবতা ও নারীচেতনায় সুচিত্রা ভট্টাচার্য ও
অমর মিত্রের উপন্যাস:: সঞ্চিতা ঘোষ.....৩২০
৪৩.দিব্যেন্দু পালিত : লেখনীর চলমানতা; লেখকের জন্ম
:: আজিজুল হক.....৩২৫
৪৪.শচীন দাশের নির্বাচিত উপন্যাসে জননী চরিত্রের
বহুমাত্রিক দিক :একটি অনুসন্ধান:: জহিরুল রহমান মণ্ডল.....৩৩২
৪৫.হেটোরোটোপিয়া, না বাস্তবতা? বর্তমান রাজনীতির একটি
সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:: অমলেশ কুমার প্রধান.....৩৩৭
৪৬.অমর মিত্রের 'মোমেনশাহী উপাখ্যান' উপন্যাস : ময়মনসিংহ
গীতিকার বিনির্মাণ:: ড. আনিসুর রহমান.....৩৪১
৪৭.ঘনশ্যাম চৌধুরীর গল্প : চেনার মধ্যে অচেনা জগৎ
:: ড. আশিস রায়.....৩৫০
৪৮.নাগার্জুন ও শূন্যবাদ : একটি সমীক্ষা::ড.দেবব্রত সাহা.....৩৬২
৪৯.অধ্যাত্মবাদের প্রেক্ষিতে জৈন নীতিতত্ত্বের কয়েকটি দিক
:: ড. দেবশ্রী ভট্টাচার্য্য.....৩৭০
৫০.রবীন্দ্রনাথের মুক্তির চেতনা : 'গোরা' ও 'মুক্তধারা'
:: ড. মহঃ মাইনুল হক.....৩৮১
৫১.আধুনিক গল্পে অত্যাচার ও প্রতিবাদ চিত্রায়ণে পৌরাণিক
আকল্পের ব্যবহার :: ড. পাপড়ি বিশ্বাস.....৩৮৯

ঘনশ্যাম চৌধুরীর গল্প : চেনার মধ্যে অচেনা জগৎ

ড. আশিস রায়

সমাজ, সাহিত্যেরই একটি অঙ্গ। কিন্তু সাহিত্যে সমাজের প্রতিফলন কি ভাবে ঘটবে তা নির্ভর করে সাহিত্যিকের মনের উপর। কেউ সমাজের শঠতা, ক্রূরতা, ভণ্ডামী ও তথাকথিত আভিজাত্যের মুখোশকে তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করে সামাজিক নগ্নতার অবসান চান, কেউবা আবার সমবেদনার অশ্রুজলে বিধৌত করে অধঃপতিতকে সমপর্যায়ে তুলে আনতে চান। কেউ বা চান সমাজের মহত্তর দিকগুলির অনুধাবন। নগ্নতা, হিংস্রতা, ব্যভিচারের পূতিগন্ধময় পঙ্কে এঁরা সকলেই লেখকরূপে সমাজ সচেতন, কারণ সমাজ সচেতনতা ছোটগল্পের মৌলধর্ম।

ঘনশ্যাম চৌধুরীর গল্পে সমাজের বিধিবদ্ধতায় আঘাত হানার প্রবণতা আছে আছে সমাজ সম্পর্কিত আলোড়ন সৃষ্টির প্রয়াস। সমাজ সংস্কারের দাবী আছে। আর মানব মনের অন্ধকার ও চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্বে ঘেরা ঘাত-প্রতিঘাতের মর্মান্তিক আলোড়নকে তুলে ধরার বাসনা আছে।

কলকাতায় ঘনশ্যাম চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায়। পড়াশোনা করেছেন গুপ্তিপাড়ার ফতেপুর এবং মীরডাঙ্গা পাইমারি স্কুলে। পরে গুপ্তিপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে চলে আসেন কলকাতায়। উত্তর কলকাতার সারদাচরণ এরিয়ান ইন্সটিটিউশনে নবম শ্রেণিতে পড়াকালীন ফের গুপ্তিপাড়ায় চলে যান। এরপর বর্ধমান জেলার পূর্ব সাতগাছিয়া উচ্চমাধ্যমিক স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কলকাতার বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ থেকে স্নাতক পাশ করেন। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর সম্পূর্ণ করেন। এখন তিনি বিশিষ্ট বাংলা সংবাদপত্রে সাংবাদিকতার কাজ করেন।

১৯৭৪ সালে স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশ পায়। বই আকারে প্রথম গল্পের বই - 'বীজ যেমন হয়' (১৯৯২) পরবর্তীকালে এই বইয়ের গল্পগুলির সঙ্গে আরো কিছু গল্প একত্র করে 'পুন্যিবালা ও অন্যান্য গল্প' ১৯৯৯ সালে প্রকাশ পায়। 'ঘনশ্যাম চৌধুরীর নির্বাচিত গল্প' ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়। একই ভাবে এর সঙ্গে নতুন কিছু গল্প যোগ হয়ে নতুন নামে 'সম্ভবামি' প্রকাশ পায় ২০০৫ সালে। এরপরে ঘনশ্যাম চৌধুরীর কলম আর থেমে থাকেনি, উঠে এসেছে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে একাধিক গল্প 'রাধা' (২০০২), 'খাদান' (২০০৪),

'আকাঙ্খা' (২০০৬), 'খাদানের পরে' (২০০৭), 'লীলাবতী' (২০১০)।

ঘনশ্যাম চৌধুরী শুধুমাত্র বড়দের জন্যই গল্প লেখেননি, লিখেছেন ছোটদের গল্পও— 'আনন্দ রূপকথা', 'রূপক্তহার ঝাঁপি', 'সোনা রঙের দিন', 'ইউরোপায় দুরন্ত অভিযান'। লিখেছেন একাধিক উপন্যাস— 'অবগাহন', 'বাঁশের বাঁশি' প্রভৃতি। গোয়েন্দা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি লিখেছেন একাধিক। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য— 'হাফ ডজন রহস্য', 'রাত্রির আতঙ্ক', 'অন্ধকারের হাত', 'রহস্য জমজমাট', 'অপারেশন এক্স', 'রহস্যের গোলকধাঁধা', 'ছোবল', 'নেশা' প্রভৃতি।

চেনা জায়গায় দাঁড়িয়ে অচেনা কিছু কথা বলে যান ঘনশ্যাম চৌধুরী। একটি লাইন পড়ার পর পরবর্তী লাইনে চোখ চলে যায় আপনাতেই। মানুষের ব্যথা বেদনা মানুষের জীবন সম্পর্কে অন্তহীন জিজ্ঞাসা-ব্যর্থতার মধ্যেও শুভ এষণা ঘনশ্যাম চৌধুরীর গল্পের প্রাণ ভোমরা হলেও, জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে একটা বিষাদের আস্তরণ প্রায়শঃই চোখে পড়ে। 'পুন্যিবালা' গল্প গ্রন্থের 'পুন্যিবালা গল্পে তিনি নদীর সঙ্গে পুন্যিকে মেলানোর চেষ্টা করেছেন। নদী প্রতিনিয়ত নিজের বাঁক পরিবর্তন করে, পুন্যিও তেমনি। গোবর্ধন ভালোবাসে পুন্যিকে কিন্তু পুন্যি গোবর্ধনকে পছন্দ করে না। সে বলে ওঠে '... তোর কিরে ব্যাটা! যা ভাগ!'— পুন্যিবালা গোবর্ধনের ছোঁকছোকানি এর আগেও দেখেছে। পুন্যিবালা 'অতুলের কথাও ভাবে। অতুল এখন নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে যায়। উথাল পাথাল নদীতে অতুলের নাওটা যখন বিন্দু হতে হতে মিলিয়ে যায়, পুন্যির মনটা খা খা করে।' পুন্যি ভালোবাসে ছেলেদের শরীরকে। অতুলের ডাগরডোগর চেহারা যেমন সে ভুলতে পারে না তেমন '- গোবর্ধনটা ভারী অসভ্য। কেমনই করে তাকায়। গিলে খাবে যেন ব্যাটা! পুন্যি মনে মনে বলে, তবে তাগদ আছে বটে গোবর্ধনের।' পুন্যি অতুলের সমুদ্রে ডুব দিতে চায় কিন্তু অতুল রাজি নয়। এর পরেই পুন্যির বাঁক পরিবর্তন 'গোবর্ধন মানুষীর নগ্ন শরীরটাকে পাঁজা কোলা করে বুকে তুলে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দেয়।' গোবর্ধন যখন শরীরী নেশায় মত্ত তখন নদী পাড় ভাঙতে ভাঙতে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সকলে পুন্যিকে ডাকতে থাকে, পুন্যি যেতে চায় কিন্তু গোবর্ধনের শরীরী নেশা তখনও মেটেনি। পুন্যি এবার ফিরে এসে দেখে তাদের ঘরটা নদীতে চলে যাচ্ছে। 'ভগবান! এ কি কল্লে!' পুন্যি ভাবতে থাকে সে পাপ করেছে। অতুলকে দেখে পুন্যির মনটা খা খা করে ওঠে। পুন্যি ঘরে ঢুকে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে থাকে সন্দীপ পুন্যি ও পুন্যিদের বাড়ি শুদ্ধ নিয়ে নেমে যায় গাঙে। এমন সময় উঠোন থেকে ছুটে এসে সেই ভীষণ নদীর বুকে ঝাঁপ দেয় একজন। সে অতুল। অতুল তো শুধু পুন্যির দেহকে ভালোবাসেনি, তাই পুন্যিকে ছাড়া সে নিজেও থাকতেও পারবে না। সে এভাবেই নিজের জীবন বিসর্জন দিল। ভলটেয়ার বলেছিলেন— মানুষের বাঁচার জন্য একজন ভগবান দরকার। মার্লোর ফস্টাসও তাই চেয়েছিলেন। আত্মবিধ্বংসী কামনার অনিবার্য পরিণতি হয়তো মৃত্যু, লেখক এখানে সেটাই দেখালেন। এই গল্পটির বেতার নাটক আকাশবাণীর সর্বভারতীয় প্রথম পুরস্কার

অর্জন করে।

আমরা সবাই চোর আমাদের এই চোরের রাজত্বে তবু চোর ধরা পড়লে আমরা তাকে পেটাই করি কেন? এর মূলে রয়েছে চোরকে মেরে সাধু সাজার প্রচেষ্টা। ঘনশ্যাম চৌধুরীর 'ভিন্ন গ্রহের উপকথা' ও 'হাঁটতলার পাঁচালী' অনেকটা একই রকম। 'ভিন্ন গ্রহের উপকথা' গল্পে দেখি ওপার বাংলার কিছু মানুষ এপারে চলে এসেছে। তাঁরা জীবীকার তাড়নায় চাল ব্ল্যাকে বিক্রি করে। একদিন তারা ধরা করে রেলপুলিশের হাতে ধরা পড়ে। কাজলি আর বুলুর শরীর দেখে পুলিশ দুটোর মাথা ঘুরে যায়। রেলপুলিশের মুখের ভাষার বাঁধ ভেঙে যায়— 'অ্যাই মাগী। এই ছুকড়ী দুটোর সঙ্গে শোবো। বল কি করবি। না হলে এই শালার ঢ্যামনা ছেলেটাকে পিটিয়ে হাড়গোড় ভেঙে দেবো।' কিন্তু লেখক শেষ পর্যন্ত এই অসাধু উদ্দেশ্য সফল হতে দেননি। গল্পের একদম শেষে একজন তৃতীয় পক্ষের আগমন ঘটিয়েছেন। প্রথম জি আর পি টা বুলুকে ফাঁকা বার্থের দিকে নিয়ে গেল। 'বুলু চিৎকার করে। কোঁপার টানা হ্যাঁচড়ায় বুলুর ফর্সা উরুদুটো বেরিয়ে পড়ে। ইজের দেখা যায়।' এ সময় তৃতীয় জি আর পি এর দেখা মেলে 'কাঁচাপাকা চুল, ভারিক্কী চেহারা। প্রথম জনের হাত থেকে বুলুকে ছাড়িয়ে দেয়।' এ ব্যবহারে প্রথম জন বিস্মিত হলে তৃতীয় জন উত্তর দেয় - 'এ হয়না। ভেবে দ্যাখ। আমাদেরও ছেলে মেয়ে আছে। আর আমার বড় মেয়েটার বয়েস ঠিক এর মতোই হবে।' অসাধু চক্রান্ত বেশিদিন সফল হয় না সমাজে যারা নোংরামি করে তাদেরকেও শিক্ষা দেওয়া যায় এভাবে।

একক বা বিচ্ছিন্ন আন্দোলন কখনই সফলতা আনতে পারে না। শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হলে সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হয়। এমনই ইঙ্গিত করেছেন ঘনশ্যাম চৌধুরী তাঁর 'হাঁটতলার পাঁচালী' গল্পে। মদের আড়ত চালায় যারা পুজোর চাঁদা তোলার নাম করে ব্যবসায়ীদের ওপর জুলুম চালায়। প্রথমে একক ভাবে প্রতিবাদ করে কান্তবাবু। কিন্তু ফল কিছু হয় না। বরং কান্তবাবুকে তারা মেরে দোকান ভেঙে দেয়। এরপর জ্যোৎস্না যখন প্রতিবাদ করে তখন লকড়ি জ্যোৎস্নার চুলের মুঠি ধরলে গগনের মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। আর কেউ থেমে থাকেনি, লকড়িদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘনশ্যাম এখানে কতগুলি সুন্দর কথা বলেছেন— 'এতগুলো মানুষের একধরনের ভয় আর আত্মরক্ষার ইচ্ছা ক'টা ছেলেকে শয়তান বানিয়ে দিয়েছিল। তবে মানুষ মানুষই। ঠিকঠাক সময়ে পলতেতে আগুন পড়লেই সেটা জ্বলে ওঠে। জ্যোৎস্না আজকে সেই আগুনের কাজ করলো।' পুলিশও বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তারা ধরতে এসেছে জ্যোৎস্না ও গগনকে। কিন্তু গ্রামের মানুষের প্রবল জনরোষের কাছে তারা হার মেনেছে। ব্যবসায়ী সকলে মিলে ঠিক করে নিল 'আমরা আজ থেকে আর কাউকে চাঁদা দেব না। — সেই শব্দটা কোরাস হয়ে গেল — দেব না, না-না-না-না।'

লেখক কতটা সংবেদনশীল হন, বাস্তবমুখী হন তার প্রমাণ ঘনশ্যাম চৌধুরীর

'বীজ', 'নিকট আত্মীয়', 'অপসৃয়মান বিভাজন রেখা' গল্পগুলি। 'বীজ' গল্পে দানবরা নিচুজাতের উপর অত্যাচার চালিয়েছে, নির্বিচারে হত্যালীলায় লিপ্ত হয়েছে কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি, সাধারণ মানুষরা কখনই হারে না হেরে যেতে পারে না। তাই সাধারণ মানুষের বিদ্রোহের দাবানলে দানব হেরে গেছে।

বিহারের মানুষের জীবনযাত্রা কেমন, কেমন ভাষায় কথা বলে তাঁরা, সব কিছু সঠিক ভাবে না জানালেও চলে গল্পকারদের। কিছুটা জেনে আর বিহারের কোন মানুষের মুখের গল্প শুনে কল্পনায় মিশিয়ে গল্প লেখা হয়তবা কঠিন নয়। কিন্তু ঘনশ্যাম চৌধুরী এটা কখনই করতে চাননি। তিনি তাঁর বন্ধুর সঙ্গে বিহারের সাহেবগঞ্জে গিয়ে সাঁওতাল বাড়িতে থেকেছেন। তাদের জীবনযাত্রার ভাষার বেশির ভাগটাই রপ্ত করে নিয়েছেন। 'নিকট আত্মীয়' গল্পের কাহিনিটি গরিব সিং নামে একজন লেখককে বলেছিলেন। লেখক এখানে তার বাস্তব রূপ দিয়েছেন।

'পুন্যিবালা' গল্পগ্রন্থের পনেরটি গল্পের বেশির ভাগ গল্পে বিহারের আঞ্চলিক ভাষা ভোজপুরী ব্যবহার করা হয়েছে। এই গল্প গ্রন্থের প্রতিটি গল্পে সাধারণ শ্রমিক শ্রেণি, সাঁওতালদের জীবনকে তিনি তুলে ধরেছেন এবং তাদের জীবনের বাস্তব সমস্যাকে তিনি যেমন ভাবে দেখেছেন তেমন ভাবেই তুলে ধরেছেন। যাতে কোথাও এতটুকু অতিরঞ্জিত নেই। বরং গল্প গুলি পড়লেই প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়েছে সবগুলি সহজ সাবলীল আর প্রাণবন্ত।

অশান্ত, সদ্য পরাধীন ক্ষত বিক্ষত ইরাক নিয়ে লেখক যন্ত্রণাদীর্ণ অনুভব থেকে গল্প লিখেছেন— 'দিলারা আম্মা' ও 'রিয়াজ সাদ্দাম বিরোধী ছিল' দু'টি গল্পই 'সম্ভবামি' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। 'দিলারা আম্মা' গল্পে লেখক মরুনদী টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিসের বহতা ধারা দেখতে চান তাই বেরিয়ে পড়েছেন। এমন সময় আরবী জোব্বা পরা বিরাটদেহী মানুষ লেখককে নিয়ে চলেছেন পথ চিনিয়ে। এক সময় পথ নির্দেশক চাইলেন লেখককে 'দিলারা আম্মা'র সাথে দেখা করাবেন। দিলারা আম্মার সাথে দেখা হওয়ার পর তিনি বুঝলেন ইরাকরা কি কঠিন লড়াই করছে বিদেশী ইংরেজদের বিরুদ্ধে। লেখক দেখলেন 'কি প্রচণ্ড আগুনদহনে জ্বলে উঠলো ওঁর চোখ দু'টো। সেই অগ্নিদ্যুতিতে বোধ হয় পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে ওঁদের শত্রুরা।' বসবার বড় ঘরের বউ ছিল দিল আরা বেগম। লড়াই-এ বেগমের পরিবারের পুরুষরা নেতৃত্ব দেয়। বৃটিশ সেনারা তাদের পরিবারের উপর শ'এ শ'এ বোমা ফেলে সকল মানুষকে মেরে দেয়। বেঁচে যান দিল-আরা-বেগম কিন্তু বিস্ফোরণে তাঁর হাত দুটো উড়ে যায়। এখন সেই কাটা হাত দুটোতে ভারী স্টেনগান বাঁধা। দিল-আরা-বেগম 'পাঁচ মাস হাসপাতালে ছিলেন। ফিরে এসেই নেমেছেন প্রতিশোধ নিতে। সঙ্গে আছে মানুষ। ... দিল-আরা-বেগম এখন দিলারা আম্মা হয়ে গেছেন বীর যোদ্ধাদের কাছে।' একই রকম ভাবে 'রিয়াজ সাদ্দাম বিরোধী ছিল' গল্পে দেখি রিয়াজের শিল্পীমন শাসকগোষ্ঠীর মাত্রা দিন দিন কেমন বেড়ে চলেছে। যার দাবানলে অনেক শিল্পীকে আহুতি দিতে হয়েছে।

একসময় যুবা শিল্পী রিয়াজ মহম্মদ গিলানিকেও এভাবে শেষ হতে হচ্ছে।

'প্রকৃতি কন্যা' একটি প্রেমের গল্প। পঞ্চানন আর লক্ষ্মীরাণীর বিয়ের পরে সাঁওতাল অতিথিরা সকলে পঁচাই খেয়ে চাঁটাই এর উপর পড়ে আছে। পঞ্চানন বলল— 'চল না লাখি, ইব্যাব শুতে যাই।' কিন্তু লক্ষ্মী বলে- 'হাম্যাদের বিয়াতে উয়ার খাবেক লাই, তা কেনে হব্যেক? বিয়া তো একবারই হব্যে। দুয়ারা হব্যেক নয় তুমার সঙ্গে ত্য থাঁইকব সারাজীবন।' এখানে লেখক সমাজের কোন জটিল বা কুটিল চরিত্র অঙ্কন করেননি।

'হিসেব নিকেশ' গল্পে অম্বিকা রায় প্রতিমুহূর্তে প্রকৃতিকে ঠকিয়ে চলেছে। তিনি পিলারিংয়ের কাজে কত কম বালি দেওয়া যায় এ ব্যাপারে তিনি সিদ্ধ হস্ত। একসময় দেখা যায় ধস্ নেমে অম্বিকা রায়ের কোয়ার্টারি ড্যামেজ হয়েছে। তার দু'মেয়ে তার মধ্যে আটকে গেছে। শূন্য সুড়ঙ্গে ঢুকে গেল বাড়ির অনেকটাই। উল্কা, হাহাকার আশঙ্কা আর শশ্মানের পরিবেশ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রতনপুর খনি এলাকা, টিম্বার মিস্ত্রি পলান বাগদি অস্ফুটেই বলল ক'টা কথা— 'হায় রে রায় সাহেবের দল তুম্যাদের পাপকাজ তবু বন্ধ হব্যাক লাই। ধরিত্রী মাতাকে ছিঁড়্যে খুঁড়্যে লিইয়ে কাঁদিও দিব্যে বটে। লোভ কি তুম্যাদের যাবে কুনদিন?'

'শিকড়ে ফেরা' গল্পে ভোম্বল খুব সরল সাদাসিধে ছেলে। কোন পাপ কাজ করার কথা তার মাথায় আসে না। সাহামহাশয়ের আড়তে সে রাতে পাহারাদারের কাজ করে। একদিন রাত বারোটার সময় আড়তে চুরি করে মাল ঢুকলে ভোম্বলের সন্দেহ হয়। সে সাহামহাশয়ের কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইলে দোলগোবিন্দ সাহা বলতে চান না। তখনই ভোম্বল কোন কথা চিন্তা না করে ভবিষ্যতের কথা না ভেবে কাজ ছেড়ে দেন।

বস্তির মানুষের দিকে হাত না বাড়িয়ে দিলে তাদের বাচ্চারা যে অন্ধকারেই থেকে যাবে তা জানেন লেখক, সেজন্য 'তীরভূমি' গল্পে তিনি সন্দীপ ও মন্দিরার মাধ্যমে উল্টোডাঙ্গার খালপাড়ে একটা স্কুল খোলার ব্যবস্থা করেছেন। 'পাতাল সুড়ঙ্গে বিষ' গল্পে সমস্ত মানুষকে একসঙ্গে দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার কথা বলেছেন। একজন বিদগ্ধ পণ্ডিতের আজই মৃত্যু হলে তার খবর করে সাংবাদিকতার কেরিয়ারে অনেক দূরে যেতে পারবে সিদ্ধান্ত বাবু। কিন্তু ডা. রণবীর যখন জানাল আজ হয়ত তিনি মরছেন না তখন প্রবল টেনশনে হার্ট ব্লক করে যায় সিদ্ধান্তের। লেখক দেখালেন কোন মানুষের মৃত্যু কামনা করা পাপ। এমন ভাবে বড় হওয়ার লালসাও ত্যাগ করা উচিত।

সমাজের উচু শ্রেণির মানুষরা চায় গ্রামের দখল। সাঁওতালদের দাবিয়ে রাখতে একজন সাঁওতালরা যখনই প্রতিবাদ করতে চেয়েছে তখনই তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে রাতের অন্ধকারে। আর তারা বুঝিয়েছে দেবতা রুষ্ট হয়ে এমন কাজ করেছে। তাদের এই দুরভিসন্ধি ধরে ফেলতে অসুবিধা হয়নি বিধু মুণ্ডার। 'ভয়' গল্পে সে গ্রামের

লোকদের ডেকে এনে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছে। নকশালপন্থীরা মানুষদের কিভাবে পশু বানায় আর এই নরখাদক পশুগুলোকে পশুর মতই মরতে হয়। 'জান্তব' গল্পে ঘনশ্যাম বাবু বলেছেন— 'একটি কুকুর আর একটি মানুষ। দু'জনেই ছিল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। দুজনেরই বোধের জগতে ছিল সন্ত্রাস অথবা মৃত্যু। মানবিক অনুভূতি থেকে যা অনেক দূরে।' সাধারণ মানুষদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে গ্রাম দখলের চেষ্টা সমাজের একশ্রেণির মানুষদের মধ্যে এবং তা একসময় সফল হয় 'কী করে দাঙ্গা লাগলো' গল্পে।

একটি মিষ্টি প্রেমের গল্প 'আকাঙ্ক্ষা'। এম এ পাশ করে কলেজে চাকরি পাওয়ার পর যে বিমলেন্দু নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, সেখানে বি এ পাশ করা একটা মেয়ে ভেবলি নিজের জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। 'খোলা দরজার সন্ধানে' গল্পে ভেবলিই বিমলেন্দুকে টলিয়ে দিয়েছে। বিমলেন্দুর ভিতর থেকে কে বলছে— 'দ্যাখ, দ্যাখ বিমলেন্দু, ওইটুকু পুঁচকে মেয়ের কাছ থেকে শিক্ষা নাও। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলো না, সত্যিই আমি পারিনি।' অনেক দিনের পেন্ডিং কাজ করার জন্য বিমলেন্দু ছুটে চলেছে।

'রাধা' গল্প গ্রন্থের 'চাই তোমাকেই' গল্পে গ্রামের সহজ, সরল, আড়ম্বর মুক্ত জীবনকে চেয়েছেন। বাংলা ভাষা লেখকের প্রাণের ভাষা তিনি একে কখন ছাড়তে চান না। তিনি বলেন— 'আমি তোমাকে পেলাম। এই বৈশাখে। আমার বর্ণমালা, আমার বাংলা ভাষা, নিত্যদিন তোমাকে আমি খুঁজি। পাখির গান থেকে, মাটির সোঁদা গন্ধ থেকে, নদীর কলরোল থেকে, হে আমার বর্ণমালা, আমি তোমাকেই চাই।' শামসুর রহমানের 'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে' কবিতায় যেমন গ্রাম বাংলার চিত্র ধরা পড়েছে, 'চাই তোমাকেই' গল্পেও তেমন চিত্র পাওয়া যায়।

'মুহূর্তে' গল্পে পরিণীতা আর সৌম্য নিজেদের মধ্যে জমে থাকা ভালোবাসার কথা কেউ কাউকে বলতে পারছিল না। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পিছনের দিকে সিঁড়িতে বসে 'সৌম্য ওর হাত দু'টো ধরলো। তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ। বললো, তোমাকে আর কথার মালায় গেঁথে রাখতে চাই না, পরী মনের মধ্যে চলে এসো এবার।' 'জীবন রেখার কতটা সীমা'তে মৃন্ময় প্রতিদিন ক্লাসে দেরি করে আসে এবং খুব বিষণ্ণ থাকে। ইউনিভার্সিটির কোন কাজে তার উৎসাহ দেখা যায় না, সকলে তাকে স্বার্থপর বলে জানে। কিন্তু নেহা তাকে ঠিক চিনেছে, সে ভাবে ছেলেটার কোন সমস্যা আছে। একদিন মৃন্ময় ক্লাসে না এলেও, নেহা মৃন্ময়দের বাড়ি যায়, দেখে সকলে কাঁদছে। আজ সকালে মৃন্ময় মারা গেছে। তার ব্রেন টিউমার ছিল। নেহা দেখে— 'নদীর বুক ছুঁয়ে ভেসে আসা প্রবল বাতাসের অভিঘাতে চিতার আগুন আরও দাউ দাউ করে জ্বলছে এখন।' চল্লিশ বছরের সহেলির শরীর অটুট বন্ধন এখনও ছাব্বিশ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। সরকারী চাকুরিতে তার ডেপুটি যাঙ্ক। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে হাল্কা বৃষ্টি হচ্ছিল। সহেলির মনটা আজ খুব ভালো— 'বাথরুমের আয়নায় নিজের

নগ্ন শরীর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল সহেলি। ... নিজের মুখবয়ব, স্তন, উরু, উরুসন্ধি, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সহেলি নিজেই নিজের প্রেমে পড়ে যায়।' আজ সহেলী শেখরের সঙ্গে কোন ঝামেলা করবে না। তার বালিকা সুলভ মন নিয়ে এখনও বাঁচতে চায় হাসিতে, খুশিতে, যৌনতায় কিন্তু শেখর এসবের কোন পাত্তা দেয় না। সে অ্যাডের জগতে নাম কিনতে চায় আরো বড়ো হতে চায়। তার মাথায় শুধু বিজ্ঞাপনের নানা নকশা ঘোরে। প্রেম করে বিবাহ করা শেখরের মনে আজ এই সকল মেয়েলি সেন্টিমেন্টের কোন দাম নেই। তাই শেখর বলে— 'বুড়ো বয়সে মাঝরাতে এসব ভালো লাগে না আমার। হাত ছাড়। শুতে দাও। এখন কোন কিছু ভাবতে ভালো লাগছে না।' সহেলি ভাবল তার মনের কথা ভাগাভাগি করার মত আজ আর কেউ নেই। যুবতী হয়ে ওঠা সহেলি ফের ফিরে গেল চল্লিশের কোঠায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক টানাপোড়েন ঘটে এভাবে।

'জন্মকথা'তে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমস্ত মানুষ একটু আশ্রয়ের খোঁজে ব্যস্ত। সেই সময় সাময়িকভাবে আশ্রয় পাওয়া হাইস্কুলে নতুন ছেলের জন্ম দেয় ফতেমা। আতঙ্কে গ্রাস করা সকলের মুখে এই নতুন ছেলেটা হাসি ফুটিয়েছে। আবার দিলীপ বাউড়ী নতুন বিয়ে করেছে। সারারাত বউয়ের সঙ্গে কাটানোর পর আজ কাজের গতি বেড়ে গেল। বউয়ের কথা মনে পড়লেই কাজে যেন আলাদা গতি পাচ্ছে সে। পঁয়ত্রিশ টন কয়লা নিয়ে ডাম্পার চালাতে শুরু করল দিলীপ। কিন্তু ডাম্পারের কোন যন্ত্র আর কাজ করছে না। ডাম্পার উল্টো দিকে চলতে শুরু করল। কিন্তু পিছন ফিরে দেখল ডাম্পার যদি নিচে পড়ে তবে কমকরে দেড়শো মানুষ মারা যাবে। ডাম্পারকে উল্টো দিকে ফেলে নিজের জীবন দিয়ে দেড়শো মানুষকে বাঁচালো দিলীপ বাউড়ী। 'মরদ' গল্পে কয়লা খাদানের হাজার হাজার মানুষের কাছে দিলীপ বাউড়ী সত্যিকারের 'মরদ' হয়ে রইল।

'খাদান' গল্পগ্রন্থের 'লেখকের কথা'তে ঘনশ্যাম চৌধুরী বলেছেন— 'গত কয়েক বছর ধরে বার বার ছুটে গিয়েছি কয়লাখনি অঞ্চলে, রুক্ষ মালভূমি এলাকায় কয়লাখনির গভীরতম সুড়ঙ্গে নেমে বুঝবার চেষ্টা করেছি তারা সেখানে কেমন করে কাজ করেন। শ্রমিক ভাইদের ধাওড়ায় তাদের সঙ্গে, কখনো কখনো তাদের বাড়িতে থেকে সেই জীবনের স্বাদ পাবার চেষ্টা করেছি।' এই কথাগুলির প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর সমস্ত গল্পে। 'সবুজ রুইদাস' কোলিয়ারি শ্রমিক- সে গান গায়, গান বাঁধে। টুসু, ভাদু আর বাউল গান— ভরা বর্ষার দামোদারের মতো ঢেউ তুলতো মানুষের মনে। কিন্তু এই সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয় না খনি শ্রমিকদের কাছে। যে দুর্ঘটনায় রাতের ঘুম কেড়ে নেয় সমস্ত ধাওড়াবাসীদের। এই সমস্ত ঘটনা যখন ঘটে মানুষ তখন খুব অসহায়। গায়ক সবুজ রুইদাস দ্যাখে খনি মুখ থেকে আগুনের হালকা ধোঁয়া আর বারশো পরিবারের বৌ-বাচ্চা-বাবা-মায়েদের। তাদের 'শনসার তো ডুবর্যে হবার।' ই সি এল অনেক মালিক খনি বন্ধ করে দিচ্ছে। লেখক সবুজ রুইদাসকে শিল্পী হিসেবে

এঁকেছেন- তাই সমূহ সর্বনাশের মধ্যে শিল্পী ভেঙে পড়ে না। শিল্পীর শক্তি অপরিমেয়। দুর্যোগের মধ্যে কাহিনিকার রুইদাসের হাতে একতারা ধরিয়ে দেন। রুইদাস একতারার তারে আঙুল চালায়। তখন 'জ্যোৎস্নালোকিত' মালভূমির কঠিন প্রান্তরে ভেসে বেড়ায় সে সুর।

'আপনজন' গল্পে ক্যাপ ল্যাম্প মাথায় লাগিয়ে মাইনিং হেলমেট পরে। পায়ে নির্দিষ্ট মাইনিং সু গলিয়ে অ্যাটনডেন্স খাতায় সই করে সকলে নেমে পড়ে খাদে। সেখানে একজন শ্রমিক 'সুড়ঙ্গ' পথে অসুস্থ হয়েছে। তাকে ওষুধ দিয়ে ডুলি করে ওপরে উঠতে থাকে খাড়া সুড়ঙ্গ বেয়ে। পাঠককেও লেখক এখানে খনি অঞ্চলের সহযাত্রী করে নিয়েছেন। গল্পটিতে কোন মজুরকে তিনি বড় করে দেখান নি, বড় করেছেন খনির ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার নৌশাদ আলি সাহেব। এই বিপদের দিনে নিজের জীবন বিপন্ন করে আটকে পড়া অসুস্থ শ্রমিককে বাঁচাতে গিয়ে নিজের ডান হাতটা খোয়ালেন। হাসপাতালে নিজের ডানহাতটা নেই জেনেও তিনি বলেন— 'সব ঠিক আছে। তোমরা ভেবো না। এখনো তো বাঁ হাতটা আছে রে ... বাপু। ... বাঁ হাতেই কাজ করবো। আর তোমারা রইলে তো। তোমরা আমার ডান হাত।' আলি সাহেবের সেই হাসি কেমন দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

কোলিয়ারিকে কেন্দ্র করে যে ভদ্রজন তাদের নিয়েও গল্প আছে এ সংকলনে। শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা সুমন্ত বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যে গল্প, তার নাম 'ফাঁদ'। ইউনিয়নের নেতা এখানে ঘামের রঙ কালো আর আছে কালো রাত- যে রাতে বেআইনি ভাবে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় টন টন কয়লা- বারিন চৌধুরীর কারসাজিতে (গরম ভাতের স্বপ্ন)। সাম্প্রতিক কালের খবরগুলো আমাদের জানান দেয় বেআইনি ভাবে কয়লা তোলাটা কি ঝুঁকির গল্প হলেও সমস্ত ঘটনা সত্যি। মাটির তলায় জৈব-শিলায় রূপান্তর শুধু তো গাছপালার নয়—মানুষেরও।

সাধারণ মানুষের, শ্রমজীবী মানুষের লোভ লালসার কথাও ঠাঁই করে নিয়েছে তাঁর গল্পে (অন্ধকারের দিকে)। ফেকলুরামের বৌ শরবতিয়ারা হারিয়ে যায় সেই লোভের ফাঁদে। রহস্য গল্পের মতো - 'নিয়তি ছিল অন্ধকারে'র কাহিনি। আধা ভৌতিক কাহিনি। গোপীনাথ মাণ্ডি কলিয়ারির চোদ্দ নম্বর পিটের শ্রমিক। সন্ধের শিফটের শেষে বাড়ি ফিরছিল রেললাইন ধরে। এখানে গল্পের ভাষা অনেক কাব্যময় এবং সেই সঙ্গে রহস্যের আবেশে ভরা। রেললাইনের ওপর এখন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেছে একত্রে- যেন কোলিয়ারি শ্রমিক জীবনের প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত বহন করে।

'পুরোনো পৃথিবীর মানুষ'— আবারও এক ছিন্ন স্বাদ বহন করে আনে। লখনডাঙ্গা গ্রামের পুরনো বাসিন্দা বিষম মাঝি। সে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাহিনি শোনায় শ্রোতাদের। কয়লাখনি আবিষ্কার এবং সেই কোলিয়ারি গড়ে ওঠার ইতিহাস। এ বড়ো বেদনারও ইতিহাস। সেখানে সিদো-কানোর থান। 'শোভেল', 'ডাম্পার',

'ড্রেজার' এর গর্জনে সেই পুরনো বটগাছ উড়ে গেল। বিবর্ণ মাঝি আর্ত চিৎকার করে ওঠে। এই আর্তি লেখকের অনুভবেও গুমরে ওঠে। 'খাদান' গল্প গ্রন্থে কিছু ভিন্ন স্বাদেরও গল্প আছে - 'কালো মেয়ের কথা', 'দীপ্ত আগুন শিখা', 'ভঙ্গি দিয়ে ভোলানো নয়।' আরও একটু অন্যরকম তিনটি গল্প হল 'রাঙা বউ', 'জীবনের চলচ্চিত্র' এবং 'দূরবর্তী ভূমি'। রাঙা বউ শুরু এভাবে— রাঙা বাগদিকে সবাই বলে রাঙাবউ। কারণ সে যে 'কালোবরণ কন্যা। ... আহা, এ শরীর শরীর তো নয়, পাথর ছেনে গড়া যুবতী। ভাঁজে ভাঁজে স্বপ্ন টানে। এমনই মেয়ে।' এ এক অয়রানি। কালো হিরের গ্রাম আর কালো হিরের এ রাস্তায় এমন কালো বৌ মানায় ভালো। তার শরীরের জন্য কে না পোড়ে। স্বৈরিণী রাংগিও ভিতরে ভিতরে ভিজতে থাকে। তার একটা আশ্রয় চাই। সত্যমও আবেগে আক্রান্ত। আকাশে চাঁদ ছিল না রাতে। ছিল সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ। 'জীবনের চলচ্চিত্র' ফিল্ম কোম্পানির কাণ্ডকারখানা নিয়ে গল্প। ছবি তোলা হবে কোলিয়ারি কেন্দ্রিক কোনও কাহিনির। এটি একটি স্বতন্ত্র সমাজ। অচেনা তো বটেই। যেখানে নায়িকার একজন ডামি দরকার। তারপর নির্দিষ্ট পথে গল্প চলে। কয়লা খনির ফাটলে গর্ত আছে যে! 'ডামি' শেফালি বাউরি সেখানে হারিয়ে যায় সেই পথে যেতে। অসামান্য— 'মানবিক এবং রূঢ় কঠিন বাস্তব এক দৃশ্য' - ফিল্ম কোম্পানীর ক্যামেরায় ধরা রইল। তখন যে ক্যামেরা চলছিল। লাইভ ডকুমেণ্টেশান।

'দেবকী বেসরা' পুরনো কালের মানুষ। সে সময় ছিল অপরিমেয় লোভলালসা মুনাফা-এখন অবিবেচনা হৃদয়হীনতা অকর্মণ্যতা, ঘুষ ইত্যাদি; তার 'চোখের সামনে কেবল অন্ধকার পেছন দিকে ছুটছিল তাঁর মন। দূর-অনেক দূরের অতীত। টুকরো ছবি-অস্পষ্ট নানা কথা। তারই কিছু কিছু ঝিলিক দিয়ে ওঠে এই উন্মাদের মস্তিষ্ক। তার যন্ত্রণাতুর ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর অন্ধকার মাখানো দিগন্ত প্রসারী রুক্ষ্ম মালভূমি অঞ্চলের বিষাদকে আরো বাড়িয়ে দিলো।' সেদিন প্রতিরোধ করতে গিয়ে সব খুইয়েছিল এই উন্মাদ হয়ে বেঁচে থাকা মানুষটি।

'খাদানের পরে' গল্প সংকলনে দেখা যায় রুক্ষ্ম ভূমির আরো গভীর দেখা যায় বন্দী কালো হিরেকে মুক্তি দিতে দলে দলে গরীব মানুষ এই মালভূমি অঞ্চলে ছুটে এসেছিল। এখানকার জনপদ গড়ে উঠেছিল মূলত কয়লাখনিকে কেন্দ্র করেই। কোন সমাজ শহুরে হোক বা গ্রামীণ তার গঠন কাঠামোয় দেখা যায় অতীতের হাতধরে আসা নির্দিষ্ট ভিত্তিভূমি। বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষ কোন একটি দেশের এক জায়গায় মিলিত হয় যখন, তখন যে সমাজের সৃষ্টি হয় তা পুরো মাত্রায় আলাদা ধরনের। আর এই আলাদা ধরনের মানুষের বিচিত্র কাহিনিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ঘনশ্যাম চৌধুরীর একাধিক গল্প।

গাঙটি কুলের বেআইনি কয়লা খাদানের দুর্ঘটনার খবর সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনটি গল্প হল 'স্বপ্ন সমাধি', 'কৃষ্ণদ্বীপের মা',

'ঢুপ! এ কান্না বে-আইনি'; লেখক বলেছেন— 'চারদিকে নদীজল। অদূরে পাহাড় আকাশ ছোঁবে বলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। প্রকৃতি এখানে ঢেলে দিয়েছে তার অনুপম শিল্পরাজি। কিন্তু এখনকার মানুষগুলো কি পারে পাহাড়ের মতো শিরদাঁড়া সোজা করে আকাশের দিকে তাকাতে? কিংবা বুক চিতিয়ে বলতে পারে, আর এ ভাই! দেখ না হামকো, হামরা ভি মানুষ্য বটে! হাঁ মানুষ্য! এই কথা ওরা বলতে পারে কি? তিনটি গল্পে শ্রমিক ভাইদের স্বজন হারানো কান্না ফুটে উঠেছে। ওরা কয়লা কাটে সুড়ঙ্গে গিয়ে। তবু ওরা বৈধ শ্রমিক নয়। ধসে অথবা খনিতে জল ঢুকে গিয়ে সেই সব শ্রমিকের মৃত্যু হলে তাদের আত্মীয়দের কান্নার অধীকার থাকে না। থানার ওসির ধমক খেয়ে মৃত মানিকের মাকে তার বাপ বললো, কান্দিস লয় একদম। ইট্যে ইল্লিগ্যাল ইস্কি যেনছে বটে। সীতা কোরকে বললো ওর বাপ, ইরোনা একদম বে-কানুনী।' এখন অনেক কয়লাখনি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বে-অইনি খাদানে কয়লা তুলতে গিয়ে মরছে এমন একজন। ঘনশ্যাম চৌধুরীর গল্পে উঠে এসেছে সেই সময়ও।

'রতি বাউড়ি' গল্পে বঞ্চিতদের আরেক রূপ দেখা গেল। অসুস্থ স্বামীর পাওনার টাকা চাইতে লালসার শিকার রতি বাউড়ি। তবুও সে স্বামীকে বাঁচাতে পারলো না। এরপর সে প্রতিশোধ পরায়ণা হয়ে ওঠে। মিনারেল ওয়ার্কসের মালিক পশুপতি ভালোটিয়ার সঙ্গে 'মৈথুনলীলায় আজ সে আগ্রাসী হয়ে উঠলো ক্রমশ। রাতের আদরে আদরে চোখ বুজে আসে পশুপতির। একসময় রতি উঠে পড়ে। মেঝেতে পড়ে থাকা শাড়ির আঁচলের গিঁট খুলে বের করে একটা ব্লেড। অতি দ্রুত বিছানায় উঠে সেই ব্লেড দিয়ে সে পশুপতির কন্ঠনালী কেটে দেয়।' রতি এই পাপের জীবনটা রাখতে চায়নি। তাই সে রেলিঙ টপকে মাইথনের জলে ঝাঁপ দিয়ে স্বামীর কাছে যেতে চেয়েছে। একটু সূক্ষ্ম মোচড়ে 'স্বার্থ' গল্পে মনস্তত্ত্বকে ছুঁয়ে গেছেন ঘনশ্যাম। মায়ের কাছে কন্যাসন্তানের চেয়ে পুত্রের মূল্য বেশি হয়ে ওঠে। 'শেফালিদের কথা' গল্পে শেফালি একজন যৌনকর্মী হিসাবে গড়ে তুললেও লেখক তার মধ্যে এতটাই শক্তি জাগিয়ে দিয়েছেন যে শেফালি একটা সমাজকে পরিবর্তন করে দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছে। 'ভাষাই শুধু বদলে যায়' গল্পে মালিক শ্রেণির নগ্নরূপ উন্মোচিত হয়েছে। 'প্রকৃতি কন্যা' ও 'অমৃতের পুত্রকন্যা' দুটিই প্রেমের গল্প। 'মেহমান' গল্পে কয়লা মাফিয়া গুণ্ডা সর্দার প্রভু সিংয়ের অন্য আরেক চরিত্র ধরা পড়ে গল্পের নায়ক রঞ্জনের কাছে।

'যুগলবন্দী' গল্পে একজন শিক্ষক আদিবাসী ছেলেকে দত্তক নিয়ে উচ্চশিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু মা মরা আদিবাসী ছেলেকে দত্তক নিতে গিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়েছে। আদিবাসী মানুষরা সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের খুব একটা ভালো চোখে দেখেন না তার ছবি ধরা পড়েছে। লেখক যেমন সহজেই আদিবাসী মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছেন। এই শিক্ষককে আদিবাসী সমাজে স্বীকৃতি পেতে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

'আকাঙ্ক্ষা' গল্পগ্রন্থের আকাঙ্ক্ষা গল্পটি একটি প্রেমের গল্প। একজন ছাত্রী শিক্ষকের প্রেমে পড়ে। তার নানান ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে গল্পটি রচনা করেছেন গল্পকার। 'ষোলোটি গোলাপচারা'তে দেখা যায় সুনামিতে ভেসে যায় স্কুলের ষোলজন ছাত্রী তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রধান শিক্ষিকা মহাশয় স্কুলের গেটের দুইধারে 'এপাশের বাগানে আটখানা। ওপাশের বাগানে আটখানা। দু'পাশে ষোলজন স্কুলে থাকবে চিরকালের মতো। এই ষোলটি গাছই যেন তোমার পুরো যত্ন পায়। বুঝলে মাল্লি!' 'সরীসৃপ' গল্পে সুনামীতে ভেসে যাওয়া মানুষ প্রাণী সকলে অসহায় কিন্তু একটা সরীসৃপও এই দুর্দিনে মানুষকে নিরাপত্তার ছায়া দিয়েছে। 'নিরাপদের দ্বিতীয় সন্তান' গল্পে নিরাপদর সঙ্গে লিচু গাছের যে সখ্যতা জন্মেছিল তা দুর্দিনেও ছিন্ন হয়নি। বাঁধ ভেঙে যখন লিচু গাছটা নদীতে পড়ে গিয়েছে তখনও নিরাপদ লিচু গাছকে ছাড়লেন না। 'অশান্ত নদীর গভীর শীতল জলের আরো গভীরে ডুবতে ডুবতেও লিচুগাছ থেকে বৃদ্ধের মুঠি আলগা হোল না। পিতার বাৎসল্যে ভরা স্নেহচ্ছায়ায় বেঁধেই রাখলেন তাকে। উত্তাল নদীর গভীর কালো জলে এভাবেই তলিয়ে গেলেন নিরাপদ কর্মকার।' লেখক বলছেন— 'মুরলীমনোহর কাঞ্চনবালার পাঁচালি অন্তরমনের অন্তঃসলিলা স্বপ্নকল্পনার ত্রয়ী কাহিনি। সাধ্য আর আকাঙ্ক্ষার টানাপড়েনের রমণীর রম্য কথা।' 'তিনি যখন দামি লেখক', 'গণতন্ত্রের হাটে বাজারে', 'কঠোরভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' তিনটি গল্পই ভীষণ মজার।

'লীলাবতী' গল্পগ্রন্থের 'চম্পা', 'মানুষের খোঁজে', 'বালক রাখাল' তিনটি গল্পেই অপরূপ প্রকৃতির বর্ণনা পাওয়া যায়। নিজের গ্রামে ফিরে আসার আসার মানসিকতা গল্পগুলিতে ফুটে উঠেছে। 'অন্তলীন' এ সরল সাদাসিধে গৌরীমাসি সম্পর্কে লেখকের মনে ভুল ধারণা জন্মেছিল। গল্পের শেষে গৌরীমাসি সম্পর্কে ভুল ধারণা অন্তর্লীন হয়ে আরো অনেক বেশি পরিমাণে শ্রদ্ধাবোধ জন্মেছে। মাঝির ছেলে মাঝি হবে যত পড়াশোনাই সে শিখুক না কেন। এই ধারণাটা পাল্টে দিয়েছে লীলাবতী। কাশীনাথকে বি এ পাশের পর চাকরির চেষ্টা করার কথা সে বলেছে। কাশীনাথকে সে বুঝিয়েছেন বি এ পাশ করেছে এবার একটা চাকরির চেষ্টা কর। 'লীলাবতীর স্বপ্ন'তে কাশীনাথ ক্রমশ পরিপূর্ণ পুরুষ হয়ে উঠেছে। কয়লা শ্রমিকরা পরস্পর পরস্পরের ভাই, কেউ বিপদে পড়লে তার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। কয়লা গর্ভে আটকে পড়া শ্রমিক ভাইদের বাঁচাতে কালুয়া ঝাঁপিয়ে পড়তে একটুও দ্বিধা করেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালুয়ার ডান পা টা নষ্ট হয়ে যায়। নন্দীগ্রাম আর জঙ্গলমহলের ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে তিনটি গল্প 'মাটির স্বাদ', 'নন্দীগ্রামের মা', 'জঙ্গলমহলের পূর্ণ চাঁদ'। টগর আর দিবসের প্রেম কাহিনি 'সন্ধিক্ষণ'। টগর দিবসকে নতুন করে গড়ে তুলেছে। যেন বাঁচার আলাদা মাত্রা জুগিয়েছে। দুর্যোগের ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে গড়া 'মানুষ জমিন' তবু লেখক ভাবেন ধ্বংস কখনও শেষ কথা হতে পারে না। 'পড়ন্তবেলার মানুষ' অধর দাস 'মনে মনে পাওয়া না পাওয়ার হিসাব কষে। কিল কিনারা পায় না। শেষ পর্যন্ত

বলে, বুঝলি বউ, ল্যাহাপড়া তো জানি না। এই সার বোজা বুজলাম, যতদিন শরীলে তাগোদ সিলো, ততদিন কাম করলাম। হেই কামগুলাই থাকবো। আমাগো ত একদিন যাইতেই হইয়ো।'

কতকগুলি গল্প বাদ দিলে ঘনশ্যাম চৌধুরী প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কোন ব্যবস্থা করেননি। তার কারণ মনে হয় সত্য ঘটনা, দেখা ঘটনাই তার গল্পে তুলে আনার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি যেহেতু একজন দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক সেজন্য গল্প সংকলনগুলিতে তার সাংবাদিক সত্তা সমস্ত সততা নিয়ে উপস্থিত। অধিকাংশ গল্পে ছোটগল্পের প্রাণকেও প্রতিষ্ঠা করেছে। গল্পগুলি খুবই সহজ সরল। তার গদ্যে নাটকীয়তা খুব কম। তার জীবন দেখার বেদনা বোধেরই প্রকাশ ঘটেছে অধিকাংশ গল্পে।

গরিব দুঃখী মানুষদের সঙ্গে ইংরেজদের অত্যাচারের কাহিনিও উঠেছে ঘনশ্যামের গল্পে নতুন প্রেক্ষিতে। সংবেদশীলতার কারণে সে সমষ্টির কষ্টকে ব্যক্তিগত কষ্ট মনে করে ফেলেছে। আর এই আন্তরিক বলেই চরিত্রগুলিকে মহিমান্বিত করে নিটোল জীবনমুখী গল্প শোনাবার আকাঙ্ক্ষাও স্পষ্ট ঘনশ্যামের। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উপাদান মনস্তত্ত্বের বেড়াজাল এবং আঞ্চলিক জীবনচর্চা। অভিজ্ঞতার বাইরে তিনি কখনই যেতে চাননি। তাঁর কর্মজীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতাই তাকে সাহায্য করেছে। মানুষকে চিনতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পা চালাতে চালাতে তাদের মুখের ভাষা গানের ভাষা রপ্ত করে নিয়েছেন অসাধারণ দক্ষতায়। এই সাধারণ গরিবগুর্বো মানুষের সঙ্গে সহজ মেলামেশার সুযোগ তাকে গল্প লেখার রসদ জুগিয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। ঘনশ্যাম চৌধুরী, পুন্যিবালা, দে'জ, কলকাতা, ১৯৯২
২। ঘনশ্যাম চৌধুরী, রাধা, দে'জ, কলকাতা, ২০০২।
৩। ঘনশ্যাম চৌধুরী, খাদান, দে'জ, কলকাতা, ২০০৪।
৪। ঘনশ্যাম চৌধুরী, সম্ভবামি, দে'জ, কলকাতা, ২০০৫।
৫। ঘনশ্যাম চৌধুরী, আকাঙ্ক্ষা, দে'জ, কলকাতা, ২০০৬।
৬। ঘনশ্যাম চৌধুরী, খাদানের পরে, দে'জ, কলকাতা, ২০০৭।
৭। ঘনশ্যাম চৌধুরী, লীলাবতী, দে'জ, কলকাতা, ২০১০।